DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.228

Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 71-72, 2022
July-Sept., Oct.-Dec. 2022

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-10-23
Published: 2022-12-21

# পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন একটি পর্যালোচনা

# Instructions of Islam for Environmental Development and the Existing Laws of Bangladesh : A Review

Mohammad Abu Noman*

**[ABSTACT]**

In the context of global climate change, there is no alternative to environmental development and its preservation for the protection of human lives and their interests. Islam put the highest importance on the environmental development, its conservation, and prevention of environmental disaster. In this article, two important issues have been presented: firstly, an analysis of the importance and relation of sustainable development with the environmental development and its conservation; secondly, a comparative investigation of 'the dictations of Islam in developing and conserving the environment with 'the existing laws of Bangladesh'. The primary objective of this article is to present before the readers the policies of Islam and the similarities of existing laws and Islamic laws with respect to the environmental development and its conservation, so that environment related policies of Islam become clear to all and an initiative can be adopted to enact an effective law by incorporating those policies into the existing laws. The article has been prepared in a descriptive and analytical manner. The article makes it clear that by realizing the limitations of our environmental development there are enough scopes to find a way out of the limitations. Thus, if the problems can be identified and be solved effectively, a worthy Bangladesh with the best and sustainable environment can be made possible.

**Keywords:** Environment, Environmental Development, Catastrophe, Environment Conservation, Islamic Environment Policies, Conventional Environment Act.

* Mohammad Abu Noman is a Lecturer , Department of Islamic Studies, Bangladesh Islamic University, Dhaka, E-Mail : manomanbiu@gmail.com



**[সারসংক্ষেপ]**

*চলমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানবীয় জীবন ও স্বার্থ রক্ষায় পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো: পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে: পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের সুমহান বিধানাবলি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও নীতিমালার একটি পর্যলোচনা। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো: পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলাম ও প্রচলিত আইনের সাদৃশ্য ও ইসলামের নীতিমালা উপস্থাপন করা; যেন এ বিষয়ে ইসলামের নীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং প্রচলিত আইনের মধ্যে ঐসকল নীতি সন্নিবেশের মাধ্যমে কার্যকর আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অনুধাবন করে এ থেকে উত্তরণের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারলে একটি উত্তম ও টেকসই পরিবেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব হবে।*

**মূল শব্দ:** পরিবেশ, পরিবেশ উন্নয়ন, বিপর্যয়, ইসলামী পরিবেশ নীতিমালা, প্রচলিত পরিবেশ আইন।

## ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা ভারসাম্যপূর্ণ যাবতীয় উপাদানের সমন্বয়ে মানুষের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন। আমাদের চারপাশে যা আছে, যেমন- পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আলো-বাতাস, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, অফিস-আদালত, ঘর-বাড়ি, লতা-পাতা, আগুন, পানি, বায়ু ইত্যাদি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এ পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নেতিবাচক ভূমিকাকেই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের অবর্ণনীয় অবদানের বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ আমাদের পরিবেশকে মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে ও বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে।

বর্তমানে শিল্পোন্নত বিশ্বের অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, কলকারখানা স্থাপন, পারমাণবিক প্রতিযোগিতা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পাহাড় ও বনজঙ্গল ধ্বংস, অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার, গৃহস্থালিয় ও কল-কারখানার বর্জ্য অব্যবস্থাপনা এবং যানবাহন ও শিল্পের ধোঁয়া ইত্যাদির ফলে বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এর ফলে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা ওজোন স্তরে (Ozone Layer) ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনি রশ্মি অধিক মাত্রায়

পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে এবং নানা ধরনের নতুন নতুন রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, ভূমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা ধারণাতীতভাবে বাড়ছে। সুতরাং পরিবেশে বসবাসরত সকলের স্বার্থ রক্ষা ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার লক্ষে পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন বর্তমান জাতিসংঘের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পরিবেশ বান্ধব, সৃষ্টির কল্যাণমুখি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারও একটি বড় ইবাদত, যা আমাদের জন্য সাওয়াব ও কল্যাণ বয়ে আনবে। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ, পরিবেশ উন্নয়নের উপাদান, পরিবেশ উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামের দিক-নির্দেশনা শিরোনামে পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের একটি পর্যালোচনা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

**প্রবন্ধে উদ্ধৃত সংশ্লিষ্ট পরিভাষা বিশ্লেষণ**

**ক. পরিবেশ:** পরিবেশ শব্দটি আভিধানিক অর্থে অবস্থা, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদিকে বোঝায় (Choudhury 2016, 793)। পরিবেশের আরবী প্রতিশব্দ হলো بيئة (বীআ)। এর শাব্দিক অর্থ স্থান বা বাসস্থান (الأصلُ في البَاءةِ المَنْزِل)। 'বীআ' 'বাআ' ও 'মাবাআ' শব্দগুলো কোনো জাতির বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপত্যকা বা পর্বতচূড়া, যেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে আশ্রয় নেয়। এ থেকে যে স্থানে পানি পান করানোর জন্য উটকে বসানো হয় বা যেখানে সে রাত কাটায় তাকে 'মাবাআ' বলা হয় (Ibn al Manẓūr 1414 H, 1/39)।

পরিবেশ সংজ্ঞায়নে ড. এফ.এম. মনিরুজ্জামান বলেন, 'আমাদের চারপাশে যা দেখি বা যে সমস্ত জটিল উপাদানসমূহের বস্তুসম্ভার আমাদের স্বাস্থ্য, ভালো-মন্দ ও সুখ-দুঃখের উপর কর্তৃত্ব করে তা দিয়েই গড়ে উঠে আমাদের পরিবেশ' (Maniruzzaman1997, 19)।

পরিবেশ বিজ্ঞানী মেলজার (Malezer) বলেন,"Environment should be defined as the total of everything that directly influences the animals change to survive and reproduce."

'যেসব শর্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশগতি বিস্তারের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে সেসব শর্তের সম্মিলিত যোগফলই হলো পরিবেশ' (K. Singh, C. kundu & Singh 1998, 40)। বস্তুত আমাদের চারপাশে যা আছে, যেমন- পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আলো-বাতাস, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, অফিস-আদালত, ঘর-বাড়ি, লতা-পাতা, আগুন, পানি, বায়ু ইত্যাদি সবকিছু মিলে আমাদের পরিবেশ। বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ২০০৫ অনুসারে পরিবেশ বলতে বোঝায়, পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও এদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক



সম্পর্কসহ এদের সাথে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক।

**খ. পরিবেশ উন্নয়ন:** পরিবেশ উন্নয়ন বা সংরক্ষণ বলতে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বিষয়গুলো প্রকৃত অবস্থায় রক্ষা করা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই জগতকে যেভাবে সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সংরক্ষণ করাকে পরিবেশ সংরক্ষণ বলা হয়। সর্বোপরি স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর জীবন ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণই পরিবেশ উন্নয়ন। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ২০০৫ এর ধারা ২(ঘ) অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ অর্থ হলো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত মানের অবনতি রোধ।"

**গ. পরিবেশ বিপর্যয়:** বিপর্যয় শব্দটির আরবী পরিভাষা হলো فساد (ফাসাদুন)। ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে(২০১১ইং) 'বিপর্যয়' এর বাংলা অর্থ হলো- উলট-পালট, নিদারুন বিশৃংখলা, বিনাশ, ধ্বংস, দুর্দৈব ইত্যাদি। فساد এর ইংরেজি পরিভাষা হলো Rottenness, spoiledness, decay, iniquity ইত্যাদি (Cowan 1976, 712)। পরিবেশ বিপর্যয় বলতে পরিবেশের সাথে যথাযথ আচরণ না করে অনাচার করা তথা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবেশের যেসব উপাদান থাকে তাদের যেকোনো একটির পরিমাণ বা ঘনত্ব গ্রহণযোগ্য মাত্রার তুলনায় বেড়ে গেলে সে অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ বিজ্ঞানী ই.পি ওডাম (E.P. Odum) বলেন, "Polution is an undesirable change in the physical, chemical or biological charcteristics of our air, land and water that may or will harmfully affect human life or that of desirable species, our industrial processes, living conditions and cultural assets or that may or will waste or deteriorate our raw material resources." (Ravi 2011, 876) । বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) অনুসারে পরিবেশ দূষণ হলো- "বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীসমূহের পরিবর্তন অথবা বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসত্মক কার্য।"[১]

**ঘ. ইসলামী নির্দেশনা:** ইসলামী নির্দেশনা বলতে ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের আলোকে পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং বিপর্যয় রোধে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদিকে বোঝানো হয়েছে।

**ঙ. প্রচলিত আইন:** প্রচলিত আইন বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং বিপর্যয় রোধে প্রচলিত আইনকে বোঝানো হয়েছে।

---

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), ১৯৯৫ সালের ১নং আইন, ধারা-২ (খ)।

**পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান**

পরিবেশ সর্ম্পকে সম্যক ধারণা লাভের জন্য পরিবেশের উপাদানসমূহ সর্ম্পকে অবহিত হওয়া আবশ্যক। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো:

১. **নির্জীব উপাদান:** যে সমস্ত বস্তু বা পদার্থের কোনো জীবন নেই বা প্রাণ নেই তাদের জড়বস্তু বা জড় পদার্থ বলা হয়। যেমন- ইট, পাথর, বালি, মাটি, জল, বায়ু, পাহাড় ইত্যাদি জড় বা নিষ্প্রাণ বা নির্জীব পদার্থ। এরা নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে না। বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে চিরকাল একই জায়গায় থেকে যাবে। এদের জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই, কেবল এদের আকার বা রূপের পরিবর্তন ঘটে।

২. **সজীব বা জীব উপাদান:** যে সমস্ত বস্তু বা পদার্থের প্রাণ আছে বা জীবন আছে তাদেরকে এককথায় জীব বা সজীব বলা হয়। যেমন- মানুষ, গরু-ছাগল, বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি। এদের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জন্মগ্রহণ করে ধীরে ধীরে বড় হয় তারা একসময় মৃত্যুবরণ করে। এরা বিভিন্ন কারণে স্থান পরিবর্তন করতে পারে বা করে। আবার কোনো কোনো জীব স্থান পরিবর্তন করে না ঐ স্থানে জীবন ধারণ করতে থাকে। যেমন- উদ্ভিদ। জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও অক্সিজেনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় বাসস্থান বা বসবাসযোগ্য উপকরণ ও পরিবেশের।

৩. **প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ:** পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান বলতে বস্তুত প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বোঝায়। ভৌগোলিক উপাদানসমূহকে নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে। পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জমির গঠন, অরণ্য, পাহাড়–পর্বত, নদ-নদী, সৈকত রেখা, জীবজন্তু, গাছপালা, মানুষ প্রভৃতি। এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে। সমাজবিজ্ঞানী এল.আর বার্নার্ড (L. R. Bernard)-এর অভিমত অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশের দুটি ভাগ হলো: ক. জৈব পরিবেশ (Organic Environment) এবং খ. অজৈব পরিবেশ (Inorganic Environment)। সামগ্রিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. **অ-প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ:** পরিবেশের সকল উপাদান প্রকৃতির মুক্ত দান নয়। পরিবেশের অনেক উপাদানই মানুষের সৃষ্টি। এই সমস্ত উপাদান মানুষের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত উপাদান অ-প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়। অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন অংশ বা উপাদান হলো- সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কারিগরি পরিবেশ।

**পরিবেশ উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক**

উন্নয়নের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে ব্যবহার করছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে তার উপর উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে। মাটি, পানি, খনিজসম্পদ, জলবায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু, ফলমূল ইত্যাদি সবই এই প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্তর্গত। এ



কথা বাস্তব যে, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক গুণ বেশি। তাই মার্কিন অর্থনীতিবিদ Arthur Lewis সত্তরের দশকে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের পছন্দ বা বাছাই (Options) করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এক সময় মানুষ হেঁটে অথবা গাধা-ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত। আজ রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদির যেকোনোটাতে কম সময়ে যাতায়াত করতে পারে দূরে কিংবা কাছে। মানুষের এই যে পছন্দ বা বাছাই করার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশকে (extensive) বিস্তৃত ও নিবিড়ভাবে (intensive) ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। তাই মানুষের নিরন্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার আরেক নাম হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা রকম (diverse) ব্যবহার।

আমরা জানি প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রকৃতি ও পরিবেশ টিকে থাকে। মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যদি এই নিয়ম ভঙ্গের কারণ হয় অথবা এই নিয়মে বাধা সৃষ্টি করে তখন পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। মানুষের জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তখন প্রতিকূলে চলে যেতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, নিকট অতীতে মানুষ প্রায় সব উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচিগুলোয় শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথাই চিন্তা করত। প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর সে কৌশল ও কর্মসূচির কী প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। আজ পরিবেশের কথা বিবেচনা করে উন্নয়নকে কীভাবে পরিবেশসম্মত বা পরিবেশ-বৎসল (Enveronment-Friendlz) করা যায় সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। অন্য কথায়, এমন উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে, যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করলেও যতটুকু সম্ভব কম করবে। যার ফলে এমন পরিবেশ বজায় থাকবে যা শুধু এই প্রজন্মের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও থাকবে নিরাপদ ও অনুকূল। পরিবেশসম্মত বা পরিবেশ-বৎসল এই উন্নয়নকেই বলা হয় টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সব উন্নয়নের মূলে রয়েছে পরিবেশ। পরিবেশ আর উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী নয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশ বিনষ্ট করে বা তাকে অবজ্ঞা করে কোনো উন্নয়নই টেকসই, মানসম্পন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এজন্য শুধু সরকার বা উন্নয়ন সংস্থাকে কাজ করলে চলবে না, সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে পরিবেশ বাঁচিয়েই সব উন্নয়ন সম্ভব।

## পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামী নির্দেশনা

স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সুন্দর জীবন ও কল্যাণকর সমাজের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের অভাবে আমাদের সামগ্রিক জীবনযাপনে বহুমুখী ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আমরা পরিবেশের সুষম বেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করি। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, ফল-ফসল, আলো-বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আমাদের পরিবেশ। এসবের সুশৃঙ্খল, অনুকূল এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থিতি ও আচরণ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও বাসোপযোগী রাখতে সাহায্য করে। এসবই আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নেয়ামত। নিম্নে পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

১. **পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা:** মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো বাসস্থানের অধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর গ্রহণযোগ্য দিক হলো পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা। পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা ছাড়া নাগরিক জীবনে প্রশান্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের বসবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সবার জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আবাসনের নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলাম আবাসনের এ নীতিমালাকে সমর্থন এবং এরই বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস (Al Qurān, 16:80)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ নিরাপদ আবাসস্থলের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেন,

أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحة، والمسكنُ الواسِع، والجارُ الصالح، والمَرْكَب الهنيء

চারটি জিনিস সৌভাগ্যের প্রতীক– সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং ধৈর্যশীল বাহন (Ibn Ḥibbān 1993, 4032)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে এ বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিকল্পিতভাবে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয় বা আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্ব হবে।[২] এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করেছে, যা ১৯৯৩ সালে মন্ত্রিসভায় "জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-১৯৯৩" নামে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সাধনপূর্বক একে আরও বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "জাতীয়

২. অনুচ্ছেদ ১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২



গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬" চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এ নীতিমালা মূলত ১৯৭৬ সালে কানাডার ভ্যাংকুভারে অনুষ্ঠিত প্রথম মানব বসতি মহাসম্মেলন ও ১৯৯৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মানব বসতি মহাসম্মেলনের সুপারিশমালা ও দিক-নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সাল থেকে জাতিসংঘ প্রবর্তিত বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারসমূহের সুপারিশমালা ও ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনের মানব বসতি উন্নয়ন বিষয়ক সুপারিশমালার ভিত্তিতে প্রণীত একটি নীতিমালা।

বাংলাদেশ সরকার গৃহায়নকে মানব বসতি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ লক্ষে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিরাজমান গৃহায়ন সংকট নিরসনকল্পে অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য গৃহায়ন ব্যবস্থা সহজলভ্য করতে সচেষ্ট। সুতরাং নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এমন প্রতিটি কাজ অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে ও শাস্তির ব্যবস্থা রেখে বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করেছে সরকার। আমরা সেগুলোর প্রতিপালন করলেই পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।[৩]

২. **মৌলিক পরিষেবাগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা:** মৌলিক পরিষেবা বলতে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, খাদ্য সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

উন্নত ও সমৃদ্ধ পরিবেশের জন্য বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাপনার সকল নির্দেশনাই ইসলামে পরিলক্ষিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

এবং তোমরা খাও ও পান করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না (Al Qurān 7:31)।

পানি বিশুদ্ধ রাখতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ

তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় পেশাব না করে। ( Al Nasāyī 1406 H, 36)

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থির পানিকে বিশুদ্ধ রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাতে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে,

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (Al Qushairī ND, 654-94)

৩. জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৬, ২০১৭, পাতা: ৭৯৫২

পরিবেশ সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্মল রাখতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ" قِيلَ: مَا الْمَلَاعِنُ الثَّلاثَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ

তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ পরিহার করো। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনটি অভিশপ্ত কাজ কী কী? তিনি বললেন, মানুষের ছায়া গ্রহণের স্থানে, যাতায়াতের পথে এবং পানির ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করা। (Al Sijistānī ND, 26)

মৌলিক পরিষেবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য মানব জীবনে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অন্যতম নেয়ামত। স্বাস্থ্যের নেয়ামতের বিষয়ে অসতর্কতা ও অবহেলা সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্তক করে বলেন,

نِعْمَتَانِ مَغبونٌ فِيهِمَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

দুটি নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অসতর্ক ও প্রতারিত: সুস্থতা ও অবসর (Al Bukhārī ND, 5/2357)।

অসুস্থতার অন্যতম কারণ অপরিচ্ছন্নতা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। মুমিনের উচিত অপরিচ্ছন্নতা জনিত রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে ইসতিনজা, মেসওয়াক, ওযু, গোসল, পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিকভাবে সুন্নতী পদ্ধতি গ্রহণ করা। তবেই তিনি সহজেই অপরিচ্ছন্নতা জনিত রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। অথচ আমরা সাধারণত ইসতিনজার স্থান এত নোংরা করি, যা পরিবেশকে মারাত্মক দূষণ করে এবং রোগব্যাধির কারণ হয়।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮ তে বলা হয়েছে: জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সকল প্রকার আবাসন প্রকল্পে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাটবাজার, সেবা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, সুইমিংপুল বা পুকুরের জন্য জায়গা নির্ধারণ এবং পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য নিষ্কাশন, পানি নিষ্কাশন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হবে। মানবেতর ও অস্বাস্থ্যকর বসতির মানোন্নয়নের জন্য ন্যূনতম মৌলিক অবকাঠামো স্থাপন এবং তার খরচ পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ নেয়া হবে।[৪]

**৩. বস্তি উন্নয়ন :** ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ, গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অধিক হারে শহরমুখী হওয়া, নগর

৪. জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৬, ২০১৭, পাতা: ৭৯৬১-৬২



পরিকল্পনাবিদদের অব্যবস্থাপনা, অপরিকল্পিত অর্থনীতি ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এতে বিশেষ করে বড় বড় নগরগুলোতে ছিন্নমূল ও কর্মহীন লোকের ভীড় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং বস্তি ও স্বত্বহীন বস্তি গড়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে তীব্র আবাসন সংকটসহ পরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এসকল বস্তিবাসী মৌলিক মানবিক অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মৌলিক মানবাধিকার বঞ্চিত এসকল বস্তিবাসীকে বাদ দিয়ে সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম এসকল বঞ্চিত দরিদ্রের বিপদে সহায়তা করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তোমাদের ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে। (Al Qurān, 51:19)

জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬, ২.৫ ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তি ও স্বত্বহীন বসতি (Slums & Squatters) স্থাপনের প্রবণতা এবং সরকারি জমি ও অন্যান্য উন্মুক্তস্থানে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অবৈধ দখলের প্রয়াস, নগরায়নের চাপের ফলে সৃষ্ট গৃহ ঘাটতির সংকট হিসেবে বিবেচিত। সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বস্তি ও ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশের নগরসমূহের বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রথমত বস্তিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ এক্ষেত্রে অনুসৃত হতে পারে। ৪.৭.২ বস্তিবাসীদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত 'ঘরে ফেরা' বা অনুরূপ কর্মসূচীর আওতায় পুনর্বাসন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।[৫] সকল বিদ্যমান বস্তিসমূহে পর্যায়ক্রমে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক নির্মাণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্টাল কনস্ট্রাকশান/ট্রান্সফরমেশন) এবং পর্যায়ক্রম উন্নয়ন (গ্র্যাজুয়েল আপগ্রেডেশান) প্রক্রিয়া গ্রহণ করা জরুরী। মৌলিক মানবাধিকার বঞ্চিত এসকল বস্তিবাসীকে বাদ দিয়ে সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের নির্দেশনা ও প্রচলিত আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

**৪. সড়ক নিরাপত্তা:** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সড়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাস্তায় চলাচল করা যেহেতু জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই এর নিরাপত্তার জন্য ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। সড়ককে নিরাপদ করতে একদিকে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন হয়ে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বিষয় সরানোর নির্দেশের পাশাপাশি কোনো চালক বা অন্য কারো ত্রুটির ফলে কেউ নিহত হলে সে চালক কিংবা অপরাধীর শাস্তির বিধানও রেখেছে ইসলাম। একজন মুমিন সড়কে তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে যেমন সচেতন থাকবে, তেমনি অন্যের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন থাকবে।

৫. জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৬, ২০১৭, পাতা: ৭৯৫৬

সড়ককে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না, যেন তার এ ব্যবহার অন্যের ভোগান্তির কারণ হয়। এমন কিছু সড়কে ফেলে রাখতে পারবে না, যা অন্যের কষ্টের কারণ হয়। নিজে তো ফেলবেই না, বরং কষ্টদায়ক কোনো বস্তু পড়ে থাকলে সে তা সরিয়ে দিয়ে রাস্তা নিরাপদ করবে। যাতায়াতের পথ নিষ্কন্টক করা শুধু মুমিনের কর্তব্যই নয়; এটি ঈমানের অন্যতম শাখাও বটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই বলা এবং নিম্নতর হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। (Al Qushairī ND, 152-57)

ফলের খোসা, ময়লা, উচ্ছিষ্ট খাবার, দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন কোনো জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তায় ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। এ ধরনের কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরানো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার অসিলা হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كان على الطريقِ غصْنُ شجرةٍ يؤذي الناسَ ، فأماطَها رجلٌ ، فأُدْخِلَ الجنَّةَ

একবার রাস্তার ওপর একটি গাছের ডাল পড়ে ছিল, যা মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ছিল। অতঃপর এক লোক তা সরিয়ে দিল। এর ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করেছেন (Al Bukhārī ND, 624)। অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِن ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ

আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতের এক গাছের নিচে চলাচল করতে দেখলাম। (জান্নাতে তার এ পুরস্কার লাভের কারণ) সে এমন একটি গাছ সে মানুষের চলাচলের পথ থেকে কেটে দিয়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত। (Al Qushairī ND, 1914)

অবৈধভাবে দখলের ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় অনেক সময় বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তা দখলের ব্যাপারে নবীজি ﷺ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ....فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ

খবরদার! তোমরা রাস্তায় বসে থেকে রাস্তা দখল করবে না। একান্ত যদি বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করবে। (Al Bukhārī ND, 2297. Al Qushairī ND, 3972)

স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।[৬] এ লক্ষ্যে সড়কে নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রণয়ণ করে। এ আইনের একাদশ অধ্যায়ে অপরাধ ও তার দণ্ড নিয়ে বিস্তারিত বিধান রাখা হয়েছে। "এ অধ্যায়ে ধারা ৬৬ থেকে ধারা ১০৬ পর্যন্ত প্রায়

৬. অনুচ্ছেদ ৩৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২।



চল্লিশ (৪০) ধরনের কাজকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে তার দণ্ডের বিধান দেয়া হয়েছে। সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণহানীর দায়ে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারা দণ্ড ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"[৭] আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে ও সাধারণ মানুষ আইনটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে ইসলামের নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করলে মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তা নিরাপদ হবে এবং পরিবেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

**৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে ক্ষয়-ক্ষতি কমানো:** আমাদের যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সবকিছুর যথাযথ ব্যবহার, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না করলে মানব সভ্যতায় নেমে আসবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে বাড়ছে, বরফ অঞ্চলের বরফ গলছে, অতি ক্ষরা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন, আগ্নেয়গিরি, দাবানলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এসবের জন্য মানুষই দায়ী, কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের অত্যাচার, অনাচার, অবিচার তথা বিপর্যয় সৃষ্টির ফলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের ফলে জলে ও স্থলে (ফাসাদ) বিপর্যয় ঘটেছে। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (Al Qurān, 30:41)

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিরাপত্তা বিধান সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা-২০১১, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি- ২০১৯ ইত্যাদি প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং ইসলামের সুমহান নীতিসমূহ ও প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনে পরিবেশের সঠিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

**৭. বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে ইসলামের রয়েছে সুমহান নির্দেশনা- কোনো মুসলমান যদি কোনো একটি গাছ অথবা ফসল ফলায় আর সেখান থেকে যদি কোনো প্রাণী কিংবা মানুষ ফল কিংবা ফসল খায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ফলের বিনিময়ে

৭. ধারা -১০৫, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন)।

সদকার সমান সওয়াব দান করবেন। আল্লাহ তাআলা সুন্দর কথাবার্তাকে সুন্দর গাছের সঙ্গে তুলনা করে বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন, পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত (Al Qurān,14:24)।

রাসূল ﷺ গাছ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালোবাসতেন। সাহাবী আবুদ্ দারদা রা. এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি দামেস্কে একটি গাছ রোপণ করছিলেন। এমন সময় একটি লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে আবুদ দারদাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বৃক্ষরোপণ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি নবী করীম ﷺ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এ কাজটি করছেন কেন?' সাহাবী আবুদ দারদা রা. বললেন, 'আপনি এমনটি বলবেন না, আমি স্বয়ং প্রিয় নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি,

من غرس غرسًا لم يأكلْ منه آدميٌّ ولا خلقٌ من خلقِ اللهِ إلا كان له صدقةً

কোনো ব্যক্তি যদি একটি গাছ লাগায়, অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা আল্লাহর যেকোনো সৃষ্টি খাদ্য গ্রহণ করে, তখন তা রোপণকারীর জন্য একটি সদকা হিসেবেই পরিগণিত হয় (Al Dimyāṭī 1994, 312)

বন এবং বন্য পশুপাখি প্রকৃতির শোভাবর্ধক, তাই প্রিয় নবী ﷺ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মক্কা-মদীনার একেকটি বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এসব এলাকার গাছপালা কাটা এবং সেখানে বন্য পশুপাখি শিকার করা আজও নিষিদ্ধ।

বন ও বনজদ্রব্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করার জন্য সরকার ১৯২৭ সালের অতি পুরাতন আইন সংশোধন করে বন আইন ২০১৯ (খসড়া) প্রণয়ণ করে। খসড়া এ আইনে বনজদ্রব্যের সংজ্ঞা এবং এ আইনের অধীন কোন অপরাধকে বন অপরাধ বলে অভিহিত করা হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের বনের বন, বনজদ্রব্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিধি-বিধান প্রণয়ণ করা হয়েছে। যেমন- সংরক্ষিত বন, গ্রামীণ ও সামাজিক বন, রক্ষিত বন এবং বনজদ্রব্য। বন আইন ২০১৯ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[৮]

জীববৈচিত্র্য বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং এর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রণী সংরক্ষণ ও এর নিরাপত্তা আইন, ২০১২ প্রণয়ণ করে। যেন কেউ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, বন উজাড় ও বন্যপ্রাণী হত্যার মাধ্যমে পরিবেশের নিরাপত্তা,

৮. ধারা-৬৬, বন আইন ২০১৯ (খসড়া।



উন্নয়ন ও সংরক্ষণকে ব্যাহত করতে না পারে সে জন্য এই আইনের ধারা (৩৪-৪৩) এ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং পর্যাপ্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনে প্রথমবার অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[৯] সুতরাং বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের সুমহান নীতিসমূহ ও প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশের সঠিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

**৮. পরিবেশ উন্নয়নে বায়ু দূষণ রোধঃ** আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম নেয়ামত হলো বায়ু। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে খেয়াল রাখতে হবে বায়ু যেন দূষিত না হয়। বায়ু দূষিত হলে নানান রোগজীবাণু সুষ্টি হয়, যা অনেক সময় মহামারীর আকার ধারণ করে। বায়ু দূষিত হয়ে একজনের রোগ অন্যজনের কাছে স্থানান্তর হয়। আমরা অনেক সময় হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখ ঢাকি না। এতে করে নির্গত ময়লা ও জীবাণু দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতে পারে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ كان إذا عطِس ، غطَّى وجهَهُ بيدِهِ ، أوْ بثوبِهِ ، وغضَّ بها صوتَهُ.

নবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি হাত অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং আওয়াজ নিচু করতেন (Al Tirmidhī 1975, 5/86)।

বায়ু দূষণ রোধকল্পে মৃত শরীরের কোনো অংশ যত্রতত্র ফেলা উচিৎ নয়। কারণ হয়তবা সেটা একসময় শুকিয়ে বাতাসে মিশে যাবে অথবা কোনো প্রাণীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। এ জন্য ইসলামে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আদমে আ. এর দুই সন্তানের ঘটনায় এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর বাণী,

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾

অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মরদেহ কিভাবে গোপন করবে তা দেখানোর জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল.. (Al Qurān, 5:31) ।

এ কারণে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে যত্রতত্র হাঁচি-কাশি, ময়লা-আবর্জনা ও মৃত জীবজন্তু ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান। বায়ুর গুণগত মান বজায় থাকলে মানব স্বাস্থ্য ভালো থাকে, গাছের বর্ধন যথাযথভাবে হয়, কৃষি ফলন বৃদ্ধি পায়। তাই বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা জরুরি। বায়ু দূষণ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হলো বায়ুমণ্ডলে নির্গমনের পূর্বেই বায়ু দূষক উৎসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, জ্বালানি

৯. ধারা-৩৬, বন্যপ্রণী (সংরক্ষণ ও এর নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন)।

পরিশোধন, যানবাহন থেকে ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, কল-কারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, দূষণ পদার্থ শোষণ, পরিত্যক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পচনযোগ্য দ্রব্য দ্রুত অপসারণ এবং প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ।

**৯. পরিবেশের উন্নয়নে পাহাড়-পর্বত:** পরিবেশের অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রবাহ অব্যাহত রেখে পাহাড়-পর্বত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। মানুষের অদূরদর্শিতা এবং অমানবিক আচরণের কারণে প্রাকৃতিক যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে তা গোটা বিশ্বের মানুষের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফলে বায়ুতে বেড়েছে দূষণ, বেড়েছে তাপমাত্রা, বৃদ্ধি পেয়েছে রোগ-শোক এবং প্রাকৃতিক নানান বিপর্যয়। এসব বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য বিজ্ঞানীরা পাহাড়-পর্বত রক্ষাকে অন্যতম উপায় বলে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইসলাম এই প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা তৈরিতে কালজয়ী নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুপরিমিতভাবে (Al Qurān, 15:19)।

ঠিক পরের আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾

এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাহাদের জন্যও (Al Qurān, 15:20)।

আমরাই এসব জীবিকানির্ভর বস্তুসামগ্রী বা ফলফলাদিতে কৃত্রিমভাবে বিষ ঢুকিয়ে মানব সভ্যতাকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছি। অথচ ইসলামের নির্দেশনায় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ধারা ৬ এর (খ) এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড় কর্তন বা মোচন করা যাবে না। সুতরাং পরিবেশের উন্নয়নে পাহাড়-পর্বত রক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা ও প্রচলিত আইনের প্রতিপালন করলেই পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।

### পরিবেশ উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্য

পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতির কিছু উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যগুলো হলো: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন; দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, সব ধরনের দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, সব ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।



### পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রচলিত বিশেষ আইন ও নীতিমালা

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় পরিবেশের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এ সুন্দর পরিবেশ। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য অজীব ও জীব প্রতিটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক কারণে এ উপাদানগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলে সামগ্রিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। মানুষের অসচেতনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত আচরণের কারণেই পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উৎপাদিত ক্ষতিকারক পদার্থ পরিবেশ উন্নয়নে বাধার কারণ। নিম্নে পরিবেশ উন্নয়নে প্রচলিত আইন তুলে ধরা হলো:

প্রচলিত পরিবেশ আইন বাংলাদেশে পরিবেশের ওপর নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণে আইনের গুরুত্ব পেয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে- জাতীয় পরিবেশ নীতি- ১৯৯২, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০ সালে), পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭, পরিবেশ আদালত আইন-২০০০ (সংশোধিত ২০১০ সালে) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কিছু আইন। উল্লেখ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। এছাড়া পরিবেশ সমস্যার মোকাবিলায় বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার, বায়ু ও পানিদূষণ, শব্দদূষণ, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কঠিন বর্জ্য, বন সংরক্ষণ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ, উপকূলীয় বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক দুই শতাধিক আইন রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মোটরযান অধ্যাদেশ-১৯৮৩, সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র অধ্যাদেশ-১৯৮৩, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন-১৯৮৯, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬, প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০, জাতীয় পরিবেশ নীতি-১৯৯২, বাংলাদেশে পরিবেশ অবক্ষয় এবং মারাত্মক দূষণের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন, অসংগতিপূর্ণ নগরায়ণ, জমিতে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প-কারখানায় অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ, আবাসিক এলাকায় শিল্প-কারখানার অবস্থান, যথেচ্ছা বৃক্ষনিধন, অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, জোরালো শব্দের হর্ন, উপর্যুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ ইত্যাদি পরিবেশকে দূষিত করছে। ব্যাহত হচ্ছে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন।

পরিবেশ সংরক্ষণে প্রচলিত পরিবেশ আইন সত্তরের দশক থেকে বাংলদেশে পরিবেশ সংরক্ষণে শুরু হয়েছে বাস্তব কর্মকাণ্ড। ফলে জারি হয় Environment Pollution Control Ordinance, ১৯৭৭ এবং গঠিত হয় Environment Pollution Control Board. যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় ১৯৯২ সালের জাতীয় পরিবেশ

নীতিমালা। এরপর প্রণীত হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫। আইনটি কার্যকর করতে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ ও পরিবেশ আদালত আইন-২০০০ প্রণীত হয়। এছাড়া পরিবেশ সমস্যার মোকাবিলায় বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার, বায়ু ও পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কঠিন বর্জ্য, বন সংরক্ষণ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ, উপকূলীয় বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক দুই শতাধিক আইন রয়েছে। পরিবেশনীতি-১৯৯২ বাংলাদেশে সার্বিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে-১৯৯২ সালের পরিবেশনীতি ১৫টি খাত চিহ্নিত করেছে। খাতগুলো হলো: ১. কৃষি, ২. শিল্প, ৩. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান, ৪. জ্বালানি, ৫. পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, ৬. ভূমি, ৭. বন, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র, ৮. মৎস্য ও পশুসম্পদ, ৯. খাদ্য, ১০. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, ১১. যোগাযোগ ও পরিবহণ, ১২. গৃহ ও নগরায়ণ, ১৩. জনসংখ্যা, ১৪. শিক্ষা ও গণসচেতনতা, ১৫. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রচলিত বিশেষ আইন ও নীতিমালা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা গেলে একটি সুখী সুন্দর ও মানবীয় পরিবেশ গড়ে তুলা সম্ভব।

**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০ ও ২০০২ সালে) এ আইন অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অবসানের প্রয়োজনে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদিপশু, বন্য প্রাণী, মৎস্য ও গাছপালা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এই আইনের ৩ ধারায় পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যার প্রধান হবেন একজন মহাপরিচালক। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এ আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। মহাপরিচালককে পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের জন্য জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মহাপরিচালক তাৎক্ষণিক জরুরি ব্যবস্থা নিতে পারেন। এছাড়া এই আইনের ৬ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, স্বাস্থ্যহানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ করে এমন কোনো যানবাহন চালানো যাবে না। কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে মনে হলে ধারা-৭ অনুযায়ী মহাপরিচালক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন এবং ঐ ব্যক্তি নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন।

পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি ধারা-৮ মোতাবেক প্রতিকারের জন্য আবেদনের মাধ্যমে মহাপরিচালককে অবহিত করবেন। এই ধারার অধীন প্রদত্ত যেকোনো আবেদন নিষ্পত্তিকরণকল্পে মহাপরিচালক গণশুনানিসহ যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া আইনটির ধারা-৯ অনুসারে কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার



জন্য নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পরিবেশ দূষক নির্গত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করতে বাধ্য থাকবেন। সৃষ্ট ঘটনা বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত ব্যক্তি মহাপরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করবেন। এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছ থেকে মহাপরিচালকের পাওনা হবে এবং তা সরকারি দাবি (Public Demand) হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

**পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ প্রণয়ন করেছে। এতে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা, ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন, পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র, নমুনা সংগ্রহের নোটিশ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি, পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ, আপিল, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি, আপিল শুনানিকালীন পদ্ধতি, পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ, বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি, বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এই বিধিমালায় প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র এবং ১৪টি তফসিল সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন- পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ বায়ুর মানমাত্রা, পানির মানমাত্রা, শব্দের মানমাত্রা, মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা, মোটরযান জনিত নিঃসরণ মানমাত্রা, যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা, ঘ্রাণ মানমাত্রা, পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা, শিল্প শ্রেণিভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা, পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

**পরিবেশ আদালত আইন-২০০০ (সংশোধিত ২০০২ সালে)**

পরিবেশ দূষণ-সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রণীত হয়েছে। মূলত পরিবেশ দূষণ-সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যই এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ আইনের ৪ ধারা মতে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি পরিবেশ আদালতের অবস্থান হবে বিভাগীয় সদরে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে ওই আদালতের বিচারকাজের স্থানগুলো বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করতে পারবে। যুগ্ম

জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ওই আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হবে। ওই বিচারক শুধু পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করবেন।

এ আইনের ৫ ধারা মোতাবেক অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীনে অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করতে হবে এবং ওই আদালতে মামলা বিচার ও নিষ্পত্তি হবে। উক্ত ধারায় আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি পরিবেশ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে, তবে এটি হবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং সে জন্য তিনি অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পরিবেশ আদালত আইনের ৮ ধারায় পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারি আদালত বলে গণ্য হবে। কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত আইনের বিধান সাপেক্ষে দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানাবলিও প্রযোজ্য হবে।

এ ছাড়া ১১ ধারা অনুযায়ী পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ ওই রায় ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিবেশ আপিল আদালতে আপিল করতে পারবেন।

কিন্তু এসব আইন থাকা অবস্থায়ও পরিবেশ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-সংক্রান্ত অপ্রতুল ও অসমন্বিত চিন্তাচেতনাই টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি কার্যক্রম ও পরিকল্পনা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো জনগণকে জানানোর কোনো মেকানিজম যেমন নেই, তেমনি উদ্যোগও নেই। পরিবেশনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যপরিকল্পনা নেই। পরিবেশ আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকার পেতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হয়, সরাসরি পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে না। দেশের দুটি বিভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ আদালতের কার্যক্রম থাকলেও অন্যান্য বিভাগে এখন পর্যন্ত কোনো পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র দেশের জন্য একটি মাত্র পরিবেশ আপিল আদালত মোটেও পর্যাপ্ত নয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে অপর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক থাকার ফলে পরিবেশ আদালতের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি ব্যাহত হচ্ছে।



**পর্যালোচনা**

১- প্রবন্ধে উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে ইবাদতের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

২- পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হল জনপরিবেশ (Public place) নোংরা হওয়া। উপরে আমরা দেখেছি, জনপরিবেশ নোংরা করার ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন, মানুষ চলাচলের রাস্তা কিংবা বদ্ধ জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা। একই সঙ্গে জনসমাগমের স্থান থেকে ক্ষতিকারক বস্তু দূরকারীকে সর্বোচ্চ প্রতিদান 'জান্নাত' দেয়ার ঘোষণাও দিয়েছে। এ বিষয়টি থেকেই পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধে ইসলামের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রচলিত আইন তুলনামূলক নতুন। আশির দশকে এর শুরু হলেও নব্বইয়ের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এর কাঠামোগতরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। সবশেষে প্রচলিত আইনে পরিবেশের দূষণকে 'ফৌজদারী অপরাধ' হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে। তবে এর কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ।

৪- প্রচলিত আইনে পরিবেশ দূষণকে দূষণীয় ও ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এতে দূষণ প্রতিরোধে কোন উৎসাহমূলক পদক্ষেপ বা পুরস্কারের কথা আলোচিত হয়নি। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে পরিবেশ দূষণের নিষেধাজ্ঞা ও দূষণ মুক্ত করার পুরস্কার- উভয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য, যে বিধিবিধানে শাস্তি ও পুরস্কার উভয়টির কথাই উল্লেখ থাকে তা মানবমনে অধিক প্রভাব ফেলে।

**প্রস্তাবনা**

উপর্যুক্ত আলোচনায় দৃশ্যমান সমস্যাদি মোকাবিলা করে পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের সুমহান নির্দেশনা ও প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- পরিবেশ সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশনা ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।
- শিক্ষা কারিকুলামে পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন সর্ম্পকে পাঠ সন্নিবেশ করা যেতে পারে।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের নির্দেশনা ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে জুমার খুতবায় আলোচনা করা যেতে পারে।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালিসহ জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।

- সড়কপথ ও রেলপথের দু-ধার, পাহাড়, টিলা, উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিলের পাড়, বাঁধ, বেড়িবাঁধ, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ঔষধি ও ফলদবৃক্ষ রোপণ করে বাগান ও সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বন্ধ এবং বৃক্ষ কর্তনের ওপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদকে সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য, উদ্ভিদ উদ্যান, শিকার সংরক্ষিত এলাকা ইত্যাদি সৃষ্টি এবং বন-জঙ্গল, জলাশয়, নদী, সাগর দূষণমুক্ত রাখতে হবে।
- যানবাহনে সীসামুক্ত জ্বালানি ও সিএনজি ব্যবহার করতে হবে। শিল্পকারখানা এবং ইটভাটার চিমনি অনেক উঁচু করে তৈরি ও ধোঁয়া নির্গমণ হ্রাস করতে হবে।
- শিল্পকারখানার বর্জ্য খাল, বিল ও নদীতে না ফেলে ইটিপি স্থাপনের মাধ্যমে শোধন করতে হবে। যেসব শিল্পকারখানার সঙ্গে ইটিপি নেই, সেগুলোর ওপর পরিবেশ দূষণের জন্য গ্রিনট্যাক্স বা দূষণকর আরোপ ও ইটিপি স্থাপনে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে।
- শব্দ দূষণরোধে যানবাহনের হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার বন্ধ ও বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হওয়া শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- নিয়মিত Air Monitoring এর মাধ্যমে বায়ুদূষণের উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। তাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে এ দেশগুলোর ওপর গ্রিনট্যাক্স, কার্বনট্যাক্স কার্যকর করে একটি অর্থ তহবিল গঠনের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নে ওই অর্থ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

**উপসংহার**

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই উন্নয়নের মূলে রয়েছে পরিবেশ। পরিবেশ বিনষ্ট করে কিংবা তাকে অবজ্ঞা করে কোনো উন্নয়নই টেকসই বা মানসম্পন্ন করা যায় না। সুতরাং পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামী নির্দেশনা ও প্রচলিত আইন বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য। এ আইন বাস্তবায়িত হলে সমাজে বসবাসরত নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, ধনী-গরিবসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, দূষণমুক্ত, পরিবেশবান্ধব, সবুজ-শ্যামল সমাজে বসবাসের সুযোগ পাবে।



## Bibliography


Al-Qurān Al Karīm

Al Dimyāṭī, Abū Muḥammad Sharf Al Dīn ‘Abd Al Mu’min Ibn Khalf, 1994. *Al Matjar Al Rābiḥ Fī Al ‘Amal Al Ṣāliḥ.* Makka : Maktaba Wa Maṭba‘a Al Nahḍa Al Ḥadīthiyya

Al Nasāyī, Abū ‘Abd Al Raḥmān Aḥmad Ibn Shu‘aib, 1406H. *Al Sunan* . Ḥalb: Maṭba‘a Al Islāmiyya

Al Qushairī , Muslim Ibn Al Ḥajjāj Al Naisābūrī . *Al Ṣaḥīḥ.* Bairūt : Dār Iḥyā Al Turāth Al `Ilmī

Al Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn Al Ash‘Ath. *Al Sunan* . Bairūt: Maktaba ‘Aṣriyya

Al Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad Ibn ‘Īsā Ibn Sawrata, 1975. *Al Jāmi‘ Al Ṣaḥīḥ.* Cairo : Matba‘a Al Bāb Al Halabī.

Al-Bukhārī, Abū ’Abdullah Muhammad Ibn Ismā’il, ND. *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ*

Choudhury, Jamil, 2016 . *Bangla Academy Adhunik Bangla Abhidhan*

Cowan , J Milton, 1976. *A Dictionary Of Modern Written Arabic* . New York: Spoken Language Service

Ibn Al Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram Ibn ‘Alī Abū Al Faḍl Jamāl Al Dīn, 1414 H. *Lisān Al ‘Arab*. Bairūt: Dār Ṣādir

Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad Al Bustī, 1993. *Al Musnad Al Ṣaḥīḥ.* Bairūt : Muassasa Al Risāla

Maniruzzaman , F. M. 1997. *Biponno poribesh o Bangladesh* . Dhaka : Ahmed Publishing House

Ravi, S. Samuel, 2011. *A Comprehensive Study Of Education* . New Delhi: PHI Learning Private Limited

Singh, Shailendra k., Subhash C. Singh and Shoba Singh, 1998. *Ecosystem Management* . New Delhi: Mittal Publications